কিশোরদের ভয় ও আশ্চর্য আট

পল্লবী সেনগুপ্ত

অরণ্যমন প্রকাশনী

ভূ মি কা

ছোটোদের গল্প লেখার কাজটা খুব সোজা নয় বলেই আমার মনে হয়। কারণ ছোটোদের গল্প লিখতে বসে আগে নিজের মনটা ছোটোদের মতো করে নিতে হয়, ছোটোদের মতো করে ভেবে বুঝতে হয় ছোটোদের কী ভালো লাগতে পারে।

অনেকেই বলেন এই প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীরা বই পড়ে না। কিন্তু এই কথাটা পুরোপুরি ঠিক বলে আমার মনে হয় না। কারণ এটা পুরো ঠিক হলে শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলো এত তুমুল জনপ্রিয় হত না আজকের যুগে দাঁড়িয়েও। প্রতি বছর নতুন নতুন শিশু-কিশোর পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটত না এত বিপুলভাবে। তবে এটাও ঠিক যে বর্তমানের এই দ্রুততার যুগে ছেলেমেয়েদের কাছে বিনোদনের অপশন অসংখ্য। তাই বইয়ের মাধ্যমে তাদের আনন্দ দিতে হলে, সাদা পাতার কালো অক্ষরদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হলে তাদের ভালোলাগার মতো করে কিছু লিখতে হবে।

ছোটোদের গল্প লিখতে গেলেই আমি আগে নিজের স্মৃতি হাতড়ে মনে করার চেষ্টা করি যে আমি আমার শৈশব ও কৈশোরকাল ঠিক কেমন গল্প পড়তে ভালোবাসতাম, আমার সমবয়সিরাই বা সেসময় কেমন গল্প পড়তে চাইত। খুব স্পষ্টভাবেই আমার মনে পড়ে আমি এবং আমার সমবয়সিরা কৈশোরকালে যে ধরনের গল্প সবচেয়ে পছন্দ করতাম তা হল ভয়ের গল্প আর রহস্য-গল্প। রূপকথা আর অদ্ভুতুড়ে সিরিজের গল্পও ছিল ভীষণ প্রিয়। বর্তমানে আমার পরিচিতি-বৃত্তে যে সকল শিশু ও কিশোররা যুক্ত,

তাদের সাথেও কথা বলে দেখেছি ওরা বলে যে ভয়ের গল্প, ফ্যান্টাসি গল্প— এগুলো ওদের বেশি আকর্ষণ করে। আর সেই কারণেই আমি ছোটোদের লেখা লিখতে গেলে একটু বেশি প্রাধান্য দিই ভৌতিক, রহস্য বা ফ্যান্টাসি ঘরানাকে।

কিশোরদের ভয় ও আশ্চর্য আট বইটির বেশিরভাগ গল্পই হয়তো ভৌতিক নয় অলৌকিক বা নয়তো ফ্যান্টাসি ঘরানার ঠিকই, তবে এর পাশাপাশি আমি এই বইতে এমন কয়েকটিও গল্প রাখার চেষ্টা করেছি যেগুলো কিশোর মনস্তত্ত্বকে স্পর্শ করে তাদের একটা পজেটিভ মেসেজ দিতে পারার উপযুক্ত। কৈশোরকালই ছেলেমেয়েদের মনন গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাই আমি চেষ্টা করেছি প্রতিটা গল্পের মাধ্যমে এমন একটা বার্তা তুলে ধরতে যা কিশোরবেলার মনন গঠনে একটি পজেটিভ এলিমেন্ট যেন হতে পারে।

যদিও এ বই মূলত শিশু ও কিশোরদের জন্যই লেখা তবুও এ বই সেই বড়োরাও পড়তে পারেন যাঁরা বইয়ের পাতায় আজও খুঁজে নিতে চান এক টুকরো ছেলেবেলা বা মেয়েবেলা । আমি অপেক্ষমান রইলাম এই বইয়ের শিশু-কিশোর পাঠক-পাঠিকা ও কিশোর-মন নিয়ে বেঁচে থাকা 'বড়োমানুষ' পাঠক-পাঠিকাদের প্রতিক্রিয়া পাবার আশায়। ছোটোদের জন্য প্রথমবার একটা গোটা বই লিখলাম, তাই এই কাজটা আমার জন্য ভীষণ স্পেশাল। ছোটোদের ভালো লাগানোর পরীক্ষায় পাশ করলাম না ফেল করলাম এবার সময়ই সেটা বলবে ।

বিনীত,
পল্লবী সেনগুপ্ত

◆ সূ চি প ত্র ◆

দেয়ালের ওপারে	১১
ঢপের চপ	২০
ডপলগ্যাংগার	৩২
ফালতু	৪৪
হ্যাপিনেস	৫৫
মেঘনার বান্ধবী	৬৭
মুক্তি	৭৪
অকুলবাবুর কারখানা	৮৬

◆ দেয়ালের ওপারে ◆

নয়নরা আজ এসে পৌঁছেছে সুলুকপুরের বাড়িতে, মানে দেশের বাড়িতে। এটা আসলে ওর মামাবাড়ি। কিন্তু ছোটোবেলা থেকে এটাকে দেশের বাড়ি বলেই জেনে এসেছে ও। মা'ও বলেন দেশের বাড়ি, মামারাও তাই বলেন। মাসিরাও বলেন। তবে মামাবাড়ি মানে এটাও ওর আসল মামাবাড়ি না। ওর আসল মামাবাড়ি তো কলকাতায়। ওর নিজের বাড়ির থেকে দশ মিনিট দূরত্বে। এটা হল গিয়ে ওর মায়ের দেশের বাড়ি।

প্রতি বছর এখানে একবার করে আসে ওরা। মূলত শীতকালে। এই বাড়িতে থাকেন মায়ের দুই কাকা। নয়নের দাদু, মানে মায়ের বাবা চাকরি করতেন দিল্লিতে। তাই মা-মামা-মাসিরা দিল্লিতেই বড়ো হয়েছেন। আর দাদু রিটায়ারমেন্টের পর কলকাতাতেই বাড়ি করে রয়েছেন। কিন্তু দাদু দিল্লি বদলি হবার আগে ওঁরা সবাই এখানেই থাকতেন। তাই মায়েদেরও এই বাড়ির প্রতি এক অমোঘ টান।

নয়নেরও ছোটো থেকেই এই বাড়িতে আসতে ভারি ভালো লাগে। কী সুন্দর খোলামেলা প্রকৃতির মাঝখানে বড়োসড়ো তিনতলা একটা বাড়ি। তবে এই বাড়িতে আসার ওর প্রধান আকর্ষণ ছোটো থেকেই ছিলেন চিনিদাদু। চিনিদাদু ছিলেন মায়েদের এক দুঃসম্পর্কের দাদু। মায়েদেরও দাদু, কিন্তু তবুও নয়নরাও তাঁকে দাদুই বলত। মিটমিটে হাসতেন দাড়িগোঁফের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে। বাড়ির অনেকে বলতেন উনি নাকি পাগলাটে। ভুলভাল বকেন। তাই ওনার সাথে বড়ো একটা কেউ মিশত না। কিন্তু নয়নের কেন কে জানে

খুব ভালো লাগত ওনাকে। কী সুন্দর মজার মজার গল্প বলতেন। রূপকথার নানা গল্প। আবার ইতিহাসেরও নানা গল্প। কখনও রামায়ণ-মহাভারতের নানা ঘটনাই গল্পের ছলে বলতেন। তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু অসংলগ্ন কথা তিনি বলতেন বটে। যেমন একবার নয়ন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল,

"আচ্ছা চিনিদাদু, এই যে এবাড়ির লোকজন কেউ বেশি তোমার সাথে কথা বলে না, তাতে তোমার খারাপ লাগে না? একা একা লাগে না?"

প্রশ্নের উত্তরে দাদু হেসে বলেছিলেন

"না গো, দাদুভাই। একা কোথায়? আমার বাবা-মা আছেন, আমার বউ আছে। ওরা সবাই আমার সাথে গল্প করে তো।"

"ধুস! কী যে বলো তুমি। তোমার বাবা-মা তো কবেই মরে গেছেন। আর তোমার বউ! আমি তো মায়ের মুখে শুনেছি তোমার বিয়ের এক বছরের মধ্যেই নাকি তোমার বউ মারা গেছিলেন।"

"তোমায় কে বলল যে মানুষ মারা গেলে বা তারা এ দুনিয়া থেকে চলে গেলে তারা আর কথা বলতে পারে না?"

"হ্যাঁ পারে না-ই তো। আমাদের পাড়ার মুখার্জিআংকেল তো মারা গেছেন গত বছর। কই তিনি তো আর কথা বলতে পারেন না কারোর সাথে। তিনি তো হারিয়েই গেছেন। কেউ দেখতে পায় না তাঁকে।"

"না রে দাদু, তা নয়। যারা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, তারা বাস করে অন্য একটা পৃথিবীতে। এই পৃথিবী আর সেই পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধান শুধু একটা স্ফটিকের দেয়ালের। ওই দেয়াল অবধি পৌঁছতে পারলেই আবার সবাইকে ফিরে দেখা যায়। আমি তো দেখতে পাই। এই বাড়ির মধ্যে ম্যাজিক আছে। আমি তাই দেখতে পাই ওদের। কিন্তু..."

"কিন্তু কী? বলো কী?"

"মাঝে মাঝে মনে হয় ওদের আমি না দেখতে পেলেই বোধ হয় ভালো হত।"

"কেন, চিনিদাদু? ওঁরা তো তোমার নিজের লোক। তাহলে এরকম কেন বলছ?"

কেন সেদিন চিনিদাদু কথাটা বলেছিলেন সে-কথা আর জানা হয়নি নয়নের। চিনিদাদুর কথাবার্তা শুনতে পেয়ে গেছিলেন ছোটোদিদা মানে মায়ের ছোটোকাকি। তিনি এসে ওনাকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন,

"আবার? মামাবাবু, আপনি আবার ওসব আবোল-তাবোল বকছেন? এই বাচ্চাটার মাথা খাচ্ছেন? আপনার কি কোনো বুদ্ধিই নেই?"

তারপর নয়নের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেছিলেন ছোটোদিদা। ধমক দিয়ে বলেছিলেন ওই পাগলের সাথে আর কথা না বলতে।

সেবারটা পুরো ছুটিতেই সকলে নয়নকে খুব চোখে চোখে রেখেছিল যাতে ও আর চিনিদাদুর খপ্পরে না পড়ে। ক্লাস সিক্সের ছেলে, এসব ভুলভাল কথায় মাথাটা বিগড়ে যেতে কতক্ষণ!

নয়ন ভেবেই নিয়েছিল পরের বার এসে ও চিনিদাদুর থেকে ঠিক জেনে নেবে কেন ওঁদের সাথে দেখা না হলেই ভালো হত বললেন উনি। কিন্তু সে জানা আর হয়নি। কারণ সেবার ওরা ছুটি কাটিয়ে ফেরার মাস খানেকের মধ্যেই একদিন এসে পৌঁছেছিল চিনিদাদুর মৃত্যুসংবাদ।

"আমারও সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে গো। এ বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে ভাবতেই পারছি না।" মায়ের গলায় ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ল নয়নের।

হ্যাঁ, বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এই বাড়ি। এটাই ওদের শেষ আসা এখানে। তাই সবার বেশ মন খারাপ।

মা আর ছোটোদাদু মানে নয়নের মায়ের ছোটোকাকা এখন বসেছেন বাড়ির স্মৃতিচারণায়।

"হ্যাঁ রে, এই বাড়ি ঘিরে কত স্মৃতি যে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু মেজদা আর মেজবউদি দু'জনেই পর পর চলে গেলেন। তোর ছোটোকাকির শরীরও ভালো না। আর বড়দা, মানে তোর বাবা তো এখানে আর ফিরবেনও না। ছেলেমেয়েদেরও সকলে নানা শহরে নিজেদের মতো সেটল্‌ড। আমরা এই দুই বুড়োবুড়ি এই বাড়ি আগলে কী করে বসে থাকি বল এই পাড়াগাঁয়ে!", বললেন ছোটোদাদু।

"হ্যাঁ, তা-ও ঠিক।" মা সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়লেন।

নয়ন সব শুনছে চুপচাপ। কিছুই বলছে না। ও শুধু অপেক্ষায় আছে সকলের ঘুমিয়ে পড়ার। তারপরই আজ কাজে নামবে ও। কেউ বুঝতেই পারছে না নয়নের মনের ভিতর কী চলছে। কেবলমাত্র নয়নই একা জানে চার বছর আগে চিনিদাদুর মুখে শোনা কথাটা আজও মনেপ্রাণে কতটা বিশ্বাস করে ও।

২

রাত এখন গভীর। চারদিক নিস্তব্ধ। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। নয়ন পা টিপে টিপে নামল বিছানা থেকে।

নয়নের কানে বাজছে চার বছর আগে বলা চিনিদাদুর সেই কথা। এই বাড়িতে নাকি ম্যাজিক আছে। সেই ম্যাজিক খাটিয়ে মরে যাওয়া মানুষদের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া যায়।

নয়নকেও পৌঁছতে হবে। ওকে পৌঁছতে হবে রঙ্গনের

◆ ঢপের চপ ◆

মৌ রিকশা করে যেতে যেতেই ভেবে নিল ঠিক কী বলবে রিয়াকে। রিয়ার বাবা নাকি সিরিয়ালে পার্ট পেয়েছে। সেই নিয়ে কত কথা!

হুঁহ্!

গরমের ছুটি পড়ার আগে শেষ যেদিন স্কুল হল, সেদিন রিয়ার সে কী গল্প!

"জানিস, আমার বাবা সিরিয়ালে পার্ট পেয়েছে। ঋষিকুমার যে সিরিয়ালটাতে অ্যাক্টিং করেন, সেই সিরিয়ালটায়।"

শুনে তো সকলের চক্ষু একেবারে চড়কগাছ। ইরাবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস এইটের সব মেয়েগুলো ঋষিকুমারের ভীষণ ফ্যান। অমন সুন্দর দেখতে একখানা নায়কের ফ্যান হবে না তো আর কী হবে টিন-এজার মেয়েরা! উফ্‌ফ্ কী দেখতে! উফ্‌ফ্ কী অভিনয়!

এহেন ঋষিকুমারের সুপারহিট সিরিয়াল 'অবুঝ মন'-এ রিয়ার বাবা অ্যাক্টিং করবেন এটা শুনেই বিগলিত হয়ে গেছিল ওদের গ্রুপের বাকি বন্ধুরা।

"এই সত্যি বলছিস! সত্যিই কাকু ঋষিকুমারের সাথে অভিনয় করবেন?" কান এঁটো করা হাসি হেসে বলছিল পারমিতা।

"হ্যাঁ, করবে তো।" বেশ গর্বের হাসি হেসে জবাব দিচ্ছিল রিয়া।

"এই শোন না, মানে একই সিনে থাকবেন কাকু আর ঋষিকুমার?" এই প্রশ্নটা করেছিল দীপালি।

"একদম থাকবে। আরে, তোরা চিন্তা করিস না। আমি বাবাকে বলে দেব ছবি তুলতে একসাথে ঋষিদা'র সাথে। আমি ছবি পোস্ট করে দেব। তোরা দেখে নিস।" বিজয়িনীর মতো হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল রিয়া।

মৌ একেবারে সহ্য করতে পারছিল না গোটা ব্যাপারটা। ঋষিকুমার একেবারে 'ঋষিদা' হয়ে গেছে রিয়ার! ইরাবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস এইট সেকশন সি-এর ফার্স্টগার্ল মৌ আর সেকেন্ডগার্ল রিয়া। দু'জনের মধ্যেই দারুণ রেষারেষি। সবসময় দু'জন চেষ্টা করে দু'জনকে ছাপিয়ে যাবার। মৌ ফার্স্ট আর রিয়া সেকেন্ড হলেও নম্বরের ব্যবধান থাকে খুবই সামান্য। মৌ খুব ভয়ে ভয়ে থাকে। এই বুঝি রিয়া ধরে ফেলল ওকে, এই বুঝি টপকে গেল!

আসলে রিয়াটা চেষ্টাও তো তা-ই চালায়। সবসময় ধান্দা মৌকে ছাপিয়ে যাবার। মৌ কিছুতেই মানতে পারবে না কখনও রিয়া ওকে কোনোদিকে টপকে গেলে। কিন্তু হঠাৎ করে ঠিক সেটাই হল। কীভাবে যেন ওর বাবা চান্স পেয়ে গেল সিরিয়ালে! আর অমনি বাকি বন্ধুদের চোখে দুম করে স্পেশাল হয়ে গেল ও।

সারা গরমের ছুটিটা অশান্তিতে কেটেছে মৌয়ের। কিচ্ছু ভালো লাগছিল না। এমনকি ফেভারিট বাটারস্কচ আইসক্রিমও মুখে বিস্বাদ লাগছিল। শুধু বারবার মনে হচ্ছিল, এইভাবে রিয়াটা বাজিমাত করে দিল, আর ও কিচ্ছু করতে পারল না!

কিন্তু সব কষ্টেরই তো একটা শেষ থাকে। ভগবান সবারই ডাক শোনেন। তাই তো হুট করে মৌয়ের জীবনে ঘটে গেল চমৎকারটা।

নক্ষত্র চ্যানেলে যেমন 'অবুঝ মন' সিরিয়ালটা হিট তেমনই বিটা বাংলা চ্যানেলের হিট সিরিজ 'গল্প জীবন'। এই সিরিজটাতে এক-একটা গোটা সপ্তাহ জুড়ে চলে এক-একটা

গল্প। বিভিন্ন লেখকদের লেখা গল্প এখানে দেখানো হয়, বিভিন্ন অভিনেতারাও অভিনয় করেন। ইদানিং 'গল্প জীবন' সিরিজে দেখানো হচ্ছে নতুন লেখকদের গল্প, আর সেখানেই পরপর দুটো গল্প নির্বাচিত হয়েছে অবনীবাবু, মানে মৌয়ের বাবার।

অবনীবাবু অবশ্য লেখালেখিতে খুব নতুনও না। অনেক পত্রপত্রিকায় বেশ কিছুদিন ধরে লিখছেন তিনি। দু-তিনটে বইও আছে। যা'ই হোক, অবনীবাবুর লেখা ধারাবাহিক হিসেবে মনোনীত হওয়ায় তিনি যত না খুশি হয়েছেন, তার চেয়ে বেশি আহ্লাদিত তাঁর মেয়ে। উফ্‌ফ্, মৌ তো ভাবতেই পারছে না, এভাবে রিয়াকে জবাবটা দেবার সুযোগ এসে যাবে! গরমের ছুটি শেষ হতে আর মাত্র সাতটা দিন, আর তারও আগে, মানে ঠিক দু'দিন পরেই মৌয়ের জন্মদিন। প্রতিবার জন্মদিনে সব বন্ধুদের ও ফোনেই নিমন্ত্রণ করে, এবারও তাই-ই করবে। শুধু রিয়াকে বাড়িতে গিয়ে বলে আসবে। মৌ বাবার কাছে শুনেছে তাঁর গল্পটায় নায়কের চরিত্রে অভিনয় করবেন পারিজাত সেন। রিয়ার বাড়ি যাবার আসল লক্ষ্য এই খবরটুকু শুধু ওর কানে তুলে দেওয়া।

ঋষিকুমার যেমন পপুলার, পারিজাতও তাই। পারিজাত বেশি ভালো, না কি ঋষি বেশি ভালো এই নিয়ে তো বন্ধুদের মধ্যে ডিবেটের অন্ত নেই। আর সেই পারিজাতই এবার মৌয়ের বাবার লেখা গল্পে অভিনয় করবেন! ভাবতেই রোমাঞ্চ হচ্ছে! নাহ্, এই খবরটা কোনোভাবেই ফোনে দেওয়া সম্ভব ছিল না রিয়াকে। এই ধামাকাদার খবরটা পেয়ে কীভাবে রিয়ার মুখটা চুন হয় সেটাই তো দেখতে চায় মৌ।

খুব বড়ো বড়ো কথা বলেছিলি না! নে, সামলা এবার। কল্পনায় যেন রিয়ার ফ্যাকাশে মুখটা দেখতে পাচ্ছে মৌ। উফ্‌ফ্, আনন্দে বুকটা ধুকপুক করছে ওর!

◆ ফালতু ◆

"তার মানে তুমি কি বলতে চাইছ? তোমার ওই মরা গাঁইয়া বোনের অপয়া, ফালতু মেয়েটা এখন থেকে এখানে এসে থাকবে?" প্রায় চিৎকার করে উঠল সীমা। বউয়ের এই রণচণ্ডী রূপটাকে সব সময়ই খুব ভয় পায় তপেন। যথারীতি ও তাই বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ল। একটু হাত কচলে বলল,

"দেখো সীমা, আমরা ছাড়া পিউয়ের আর কে আছে বলো? তা ছাড়া, তুমি বুলির কথাটাও ভেবে দেখো। দিন দিন মেয়েটা কেমন খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। সবসময় সব কিছুতে ঝামেলা করে। আর ডাক্তার যে-কথা বলেছিলেন সেটা সত্যি হলে পিউ এলে তো ওর পক্ষেও ভালো হবে সেটা।"

"তুমি চুপ করো! আমি সাফ বলে দিচ্ছি ওই মেয়েকে আমি আমার সংসারে কিছুতেই জায়গা দেব না। এমনিতেই অপয়া, ধিঙ্গি মেয়ে একটা। বাপ-মা'কে খেয়ে বসে আছে! আর তার মধ্যে গেঁয়ো আর ফালতু। আমার বুলির সাথে ও থাকলে আমার মেয়ের ওপর কুপ্রভাব পড়বে। গ্রামের স্কুলে পড়া একটা আনস্মার্ট মেয়ে। না পারে ইংরিজিতে কথা বলতে, না জানে কম্পিউটার, না জানে ভালো আদব-কায়দা। রাতদিন এরকম একজনের সাথে থাকলে আমাদের বুলিও তো ওরকমই হয়ে যাবে। আমি কিচ্ছু জানি না, তুমি ওর অন্য কিছু ব্যবস্থা করবে, ব্যস!"

দুমদাম করে ভারী পা ফেলে চলে গেল সীমা। সোফার ওপরে ঝুম মেরে বসে রইল তপেন। মনে পড়ে যাচ্ছে অনেক পুরোনো কথা। রূপা তপেনের দুঃসম্পর্কের পিসতুতো বোন। ছোটোবেলায় বাবা-মা কে হারিয়ে তপেনদের বাড়িতে

থাকতে এসেছিল ও। তিনকুলে আর কেউ ছিল না ওর। তপেনের থেকে দু'বছরের ছোটো ছিল রূপা। তপেন তখন পনেরো, আর রূপা তেরো। আসার অল্পদিনের মধ্যেই দাদার খুব ন্যাওটা হয়ে গেছিল ও। তপেনও ভারি ভালোবাসত রূপাকে। একসাথেই বড়ো হয়ে উঠছিল ওরা। দেখতে দেখতে এক সময় বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠল সে। পাত্র নিজেই পছন্দ করেছিল। তপেনের মা ছেলের বাড়িকে বলেছিলেন,

"আমাদের তো খুব বেশি সামর্থ্য নেই। তাই বেশি খরচ করতে পারব না।" সাথে সাথে সেদিন প্রতিবাদ করে উঠেছিল রূপা।

"তোমরা খরচ করবে কেন? আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছ। এবার সব দায়িত্ব আমার নিজের। আমি তো চাকরি করি।"

ততদিনে নিজের যোগ্যতাতেই ছোটোখাটো একটা চাকরি জোগাড় করেছিল রূপা। নিজের বিয়ের যতটুকু প্রয়োজন সব করেছিল নিজেই। কারোর থেকে একটা টাকাও নেয়নি। তপেনের মনে পড়ে, প্রায়ই মা বলতেন,

"রূপা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। ওর মধ্যে খুব ভালো শিক্ষা আর সংস্কার আছে। ও যে বাড়িতে যাবে সেখানেই আলো করে রাখবে।"

সত্যিই হয়েওছিল তা-ই। বিয়ের পরে ওর বরের ব্যাবসায় খুব উন্নতি হয়েছিল। বেশ পয়সার মুখ দেখেছিল ওরা। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল! বিয়ের বছর চারেকের মাথায় রূপার কোলে এল পিউ। আর মেয়ের জন্মের এক বছরের মধ্যেই মারা গেল রূপার স্বামী রতন, একটা পথ-দুর্ঘটনায়। তারপর থেকে মেয়েকে নিয়ে একাই লড়ছিল রূপা। কিন্তু কয়েক মাসে আগে, মেয়ের বারো বছরের জন্মদিনের ঠিক আগের দিন রূপার হঠাৎ করে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। হাসপাতালে নিতে নিতেই সব শেষ। তারপর থেকেই অনেকে বলতে শুরু করেছে এই

পিউই নাকি অপয়া। জন্মে এক বছরের মাথায় বাপকে খেল, আর বারো বছরের জন্মদিনের আগের দিন মা'কে। আসলে রূপারা থাকে এক মফস্‌সল এলাকায়। সেখানকার মানুষজনদের চিন্তাভাবনা ঠিক কলকাতা বা অন্য কোনো বড়ো শহরের লোকদের মতো নয়। তাই এমন ধরনের কথাবার্তার সম্মুখীন বেশি হতে হচ্ছে পিউকে। মেয়েটা ভেঙে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে। ওইটুকু মেয়ে, ও কি এসব সইতে পারে!

পিউয়ের এখন গোটা পৃথিবীতে আপনজন বলতে একমাত্র তপেন। আর তেমন কেউই নেই। এ অবস্থায় কী করে পিউকে ফেলে দেয় ও! মেয়েটা যে বারবার বলছে,

"মামু, আমি তোমার কাছে যাব।"

কিন্তু সীমা তো পিউকে মেনে নিতে একেবারে রাজি নয়। কী যে করে তপেন! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোল ওর বুক ঠেলে। দেখা যাক কী হয়। আপাতত তো এসে থাকুক মেয়েটা। পরে নাহয় ভেবেচিন্তে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

২

"পিউদিদি সত্যি সত্যি চলে যাবে, বাবাই?" বুলি এসে জিজ্ঞাসা করল তপেনকে।

"হুম।"

"কেন, বাবাই? প্লিজ ওকে রেখে দাও না। আমার ওকে খুব ভালো লাগে।" বুলির চোখটা ছলছলে। মেয়ের মুখের দিকে তাকাল তপেন। নিজের মেয়েকেই আজকাল কেমন যেন অচেনা লাগে ওর। মাত্র ছ'মাসে এত বদল তো ভাবাই যায় না। অথচ এই বুলিকে নিয়েই তো জেরবার থাকত ওরা। কাউকে সহ্য করতে পারত না বুলি। কারোর কথা

শুনত না। ইস্কুলে গিয়ে রোজ কোনো না কোনো ঝামেলা করত। ক্লাসমেটদের মারত, তাদের টিফিন কেড়ে নিত, বই ছিঁড়ে দিত। কতবার যে টিচাররা ডেকে পাঠিয়েছেন তপেন আর সীমাকে। ওয়ার্নিংও দিয়েছিলেন গত বছর।

"আপনাদের মেয়েকে চেঞ্জ করতে না পারলে কিন্তু ওকে টিসি দিতে বাধ্য হব আমরা। এরকম মেয়েকে আমাদের স্কুলে অ্যালাও করা সম্ভব না।"

কথাটা শোনার পরই নয় বছরের মেয়েটাকে নিয়ে গেছিল ওরা চাইল্ড সায়কায়াট্রিস্ট-এর কাছে। সব দেখেশুনে তিনি বলেছিলেন,

"আজকাল ওয়ার্কিং পেরেন্টসদের একমাত্র বাচ্চাদের অনেকের ক্ষেত্রেই এমনটা হয়। ওদের মধ্যে একটা অদ্ভুত লোনলিনেস কাজ করে। ওরা তার থেকেই সেলফিশ হয়ে যায়। কারোর সাথে কোনোকিছু শেয়ার করা, কারোর সাথে অ্যাডজাস্ট করা— এসব ওরা পারে না। বুলির ক্ষেত্রেও সেই ধরনের সমস্যা হচ্ছে। আপনারা ওকে বেশি করে সময় দেবার চেষ্টা করুন। ওর এখন দরকার কোনো সঙ্গী, যার সাথে ও নিজের ফিলিংস শেয়ার করতে পারবে।"

কিন্তু বললেই কি আর হয়! তপেন আর সীমা দু'জনেই বেসরকারি অফিসে চাকরি করে। দিনের সিংহভাগ সময় বাইরেই কাটে ওদের। দু'জনের কারোরই মাইনে খুব বেশি নয়। কিন্তু খরচের তো শেষ নেই। বুলির দামি স্কুল, প্রাইভেট টিচার, কম্পিউটার ক্লাস, নাচের ক্লাস, বাড়িভাড়া, ভালো খাওয়া-দাওয়া। দু'জনে রোজগার না করলে সব সামলানো তো অসম্ভব হয়ে যাবে।

"ও বাবাই, বলো না, পিউদিদি এখানেই থাকবে তো?" বুলি আবার প্রশ্ন করছে।

"তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো, মা। আমি দেখছি।"

◆ মেঘনার বান্ধবী ◆

এই ঝিমধরা একলা দুপুরগুলোতে সবথেকে বেশি মন খারাপ লাগে মেঘনার। নিজেকে আরও বেশি একা লাগে। কী সুন্দর ওই দিল্লি শহরটায় ছিল ওরা। কত লোকজন, স্কুলে কত বন্ধু! সবকিছু ছেড়ে হুট করে এখানে চলে আসতে হল। এই কলকাতায়। নিজের পুরোনো স্কুল ছেড়ে ভরতি হতে হল নতুন স্কুলে। এখানে তো কাউকে ভালো করে চেনেই না মেঘনা। তবে ওর সব থেকে বেশি কষ্ট হয় বাপির জন্য। বাপি রোজ অফিস থেকে ফিরে ওকে কত আদর করত, ওকে কত গল্প বলত। দুপুরবেলা ঠাম্মি ওকে কত রূপকথার গল্প বলত। কিন্তু এখন সেসব কিচ্ছু নেই আর। বাপি, ঠাম্মা— সবাই রয়ে গেছে সেই দিল্লিতে। মাম্মাম জোর করে ওকে এই কলকাতা শহরটায় নিয়ে চলে এল। মাম্মাম তো সারাদিন অফিসে থাকে, আর সন্ধ্যাবেলায় ফিরেও ওর সাথে বেশি গল্প করে না। হয় ঘুমিয়ে পড়ে, নয়তো একগাদা ফাইল নিয়ে বসে বসে কীসব কাজ করে। মেঘনার যে চোখ ফেটে জল আসে সেটা কি বোঝে না মাম্মাম? মিনিমাসি, মানে এই মোটকা আর গায়ে ঘামের গন্ধওয়ালা আয়ামাসিটার কাছেই ওকে থাকতে হয় সারাদিন। ওর যে একেবারে ভালো লাগে না ওই মিনিমাসির কাছে থাকতে, সেটা কি মাম্মাম একটুও বোঝে না? আর বাপি, ঠাম্মা? ওদেরও কি মনে পড়ে না মেঘনার কথা? কতগুলো দিন তো হয়ে গেল! তবুও ওরা কেউ একবারও এল না তো মেঘনাকে দেখতে? ও শুনেছে বাপি আর মাম্মার নাকি ডিভোর্স হচ্ছে। তাই নাকি ওরা

আলাদা থাকছে এখন। ডিভোর্স মানে কী সেটা আগে না জানলেও এখন জেনে গেছে মেঘনা। সেদিন একটা সিনেমা দেখছিল মিনিমাসি আর ও ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল, আর তখনই ও শুনে নিয়েছে ডিভোর্সের মানেটা। যখন কারোর মাম্মাম আর বাপির মধ্যে খুব ঝগড়া হয় আর তারা আলাদা হয়ে যায় তাকেই নাকি বলে ডিভোর্স।

হ্যাঁ, মেঘনার বাপি আর মাম্মামের মধ্যেও তো ভীষণ ঝগড়া হত। সেইজন্যই কি ডিভোর্স হচ্ছে ওদের? কিন্তু এতে মেঘনার কী দোষ? ও তো সবার কথা শুনত, কারোর সাথে 'ফাইট' করত না। কিন্তু তাহলে আজ ওকে কেন এত কষ্ট পেতে হচ্ছে? চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে মেঘনার। রোজ দুপুরবেলা এই সময়টায় রেলিংঘেরা এই বারান্দাটায় একাই বসে থাকে ও পুতুল নিয়ে। মিনিমাসি ভিতরে হয় ঘুমায় না হয় জোরে টিভি চালিয়ে দেখে। আর তাই আরও বেশি মন খারাপ হয়ে যায় ওর।

"এই মেঘনা, এই তুই আজও কাঁদছিস?" আচমকা গলার আওয়াজে চমকে তাকাল মেঘনা। সামনে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে তিতির। ওকে দেখে মনটা একটু ভালো হল ওর। তিতির এর আগেও দু'দিন এসেছিল। এখানেই কাছাকাছি থাকে কোথাও। পরনে ময়লা ধরনের জামা। মাথার চুল এলোঝেলো। কিন্তু সবসময় মুখে লেগে থাকে মিষ্টি হাসি। এই মেয়েটা এর আগেও দু'দিন যখন এসেছিল তখনও ও মেঘনাকে কাঁদতেই দেখেছিল। তখন ওর মন ভালো করার জন্য নানা মজার মজার কথা বলছিল মেয়েটা। এই যেমন তিতির নাকি হাওয়ায় উড়তে পারে, ও নাকি গাছের ডাল ধরে দোল খেতে পারে আরও কত কী। বেশ মজা পেয়েছিল মেঘনা ওর কথায়।

"তিতির, জানিস আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না। আমার খুব একা লাগে। আমার তো কোনো বন্ধু নেই এখানে। বাপির কথাও খুব মনে পড়ে।" ভেজা গলায় বলল মেঘনা।

"ধুর বোকা, একলা লাগলে কি কেউ কাঁদে নাকি! আমারও তো বন্ধু নেই। তাই বলে কি আমি কাঁদি? আমিও তো বন্ধুত্ব করে নিয়েছি গাছ, পাখি এদের সাথে। তুইও তাই কর।" ভুরু নাচিয়ে বলল তিতির।

"আমি পাখি, গাছ এদের সাথে বন্ধুত্ব করব কী করে? ওদের সাথে কি আমি গল্প করতে পারব নাকি!"

"পারবি রে। সব পারবি। আমি শিখিয়ে দেব।"

"সত্যি বলছিস তুই?" দৌড়ে গিয়ে তিতিরকে জড়িয়ে ধরল মেঘনা।

"আর তা ছাড়া আমি তো রইলামই। খুব বেশি মন খারাপ করলে আমার কথা মনে মনে ভাববি, দেখবি আমি সামনে হাজির। আমার তোকে খুব পছন্দ হয়েছে রে, মেঘনা। দেখবি একদিন আমি তোর জন্য মুঠো ভরতি করে আনন্দ খুঁজে এনে তোকে উপহার দেব।" মেঘনার কানে ফিশফিশ করে বলল এবার তিতির।

২

"কী! ভূত? পাগল হয়ে গেছিস তুই?" প্রায় গর্জে উঠল রিয়া সরকার, যার এখন বেশ নামডাক হয়েছে শিশু-মনোবিদ হিসাবে। রিয়ার উলটোদিকে বসে রয়েছে মিত্রা।

"তুই তো জানিস আমার সাথে অজিতের একদম বনিবনা হচ্ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে সব ছেড়ে এই শহরে চলে আসতে হল আমায়। কিন্তু আমার মেয়েটা যে আস্তে আস্তে বড্ড